OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 310 - 315
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জনজীবন : প্রসঙ্গে জীবনানন্দ

উৎকলিকা সাহু
সহকারী অধ্যাপক
বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ
Email ID : utkalika.sahoo86@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Partition, communal riots, Jalpaihati, Jibanananda Das

Abstract
Partition is a very important issue. During the partition of India in 1947, many people came to India from East Bengal due to communal riots. Here they came as refugees. But their refugee life became very difficult. Many people died of hunger and disease. The novel "Jalpaihati" written by Jibanananda Das was written during this time.Through the characters of the novel he also mixed elements of his own life. Bengal was then due to Hindu Muslim communal riots,Unsettled. The central character of the novel, Nishith, comes to Calcutta in search of a teaching job. Here, the complex economic and social aspects of the period are described through various characters.

Discussion

স্বাধীনতা প্রত্যেক মানবজীবনের অতিকাঙ্খিত বিষয়। ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর বুকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেতন জনগণ প্রতিবাদী হয়ে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্তির স্বাদ পায়। কিন্তু স্বাধীনতার একদিকে যেমন অনাবিল আনন্দ প্রকাশ পায়, অপর দিকে দুঃখ যন্ত্রনা ও স্বজন হারানোর বিষাদের সুরও পরিলক্ষিত হয়। সাতচল্লিশের ভারত বিভাজনের ফলে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুহারা মানুষদের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতকে টুকরো টুকরো করে খন্ডীকরন করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি হল পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)। পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল বাংলার একটি বৃহৎ অংশ। চল্লিশের দশকের সেই ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন বাংলার ইতিহাস ও অবয়ব সম্পর্কে। প্রাচীনকালে যে ভারতের মানচিত্র ছিল তা কালের নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা বা বঙ্গের আকার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক চিত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। দেশভাগের আগের ও পরের বাংলার মানচিত্র আমূল পরিবর্তিত।

বাংলার ভৌগোলিক পরিসর উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এর পশ্চিম দিকে গঙ্গা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। আবার ব্রহ্মপুত্র নদ, পদ্মা ও গঙ্গার উচ্চতর প্রদেশ হতে মাটি এসে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে নতুন বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। ষোড়শ শতকে পদ্মার পরিবর্তিত প্রবাহ পথ সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জনপদগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়[১]। প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো নাম না থাকায় অঞ্চল ভিত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন বঙ্গ, পুন্ড্রবর্দ্ধন, রাঢ়, গৌড়। মধ্যযুগ থেকে মূলত মুসলিম শাসনকালে এই অঞ্চলগুলি একসাথে বাংলা বা বাঙ্গালা নাচে অভিহিত হতে থাকে[২]। প্রাচীন বাংলাদেশ প্রায় ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি ছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বতন্ত্র। তবুও শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর হওয়ার পর অধুনা পশ্চিমবঙ্গ মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে উৎকল পর্যন্ত একটি ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। শশাঙ্কের আমলে জনপদগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি পাল-দেব যুগ পর্যন্ত চলেছিল[৩]। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলিম বৈষম্যের কারনে বাংলায় পৃথক দুটি সম্প্রদায় পৃথক ভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা বাংলায় বানিজ্য বিস্তার করেছিল এই যুগে। চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রামে বানিজ্য কুঠী ছিল তাঁদের। পরবর্তী কালে ইংরেজরা শুজাকে বছরে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বানিজ্য করার অধিকার দিয়েছিল[৪]। পলাশীর যুদ্ধের পরে ফলাফলস্বরূপ প্রায় দুইশত বৎসর বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বানিজ্যের বেশধারী ইংরেজদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে শাসকের রাজদন্ড হাতে বাংলা তথা ভারতের শাসকে রূপান্তরিত হল। এরপর বাংলা পরাধীনতার অন্তরালে চলে যায়।

সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ও দেশভাগ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়টি ঔপনিবেশিক সরকার সহজে মেনে নেয়নি। এই প্রসঙ্গে সাতচল্লিশের ভারত বিভাজনের পূর্বের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতে বণিকের রূপে এসে ইংরেজরা সাধারন মানুষকে শোষন করছিল। বিভিন্নভাবে জমিদার, কৃষকসহ প্রজাদের ওপর তাদের অত্যাচার সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মহাবিদ্রোহের সময়কালের পর থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভারতের শিক্ষিত যুবসমাজ ও সমাজ সংস্কারকরা তাদের দেশমাতাকে ব্রিটিশদের স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেছিল। এই কারনে ১৮৭০ সালে পুণা সার্বজনিক সভা, ১৮৭৬ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৮৪ তে মাদ্রাজ মহাজন সভা, ১৮৮৫ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিভিন্ন সর্বভারতীয় গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। ১৮৮৫ তে ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সরকারের শিকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ সোচ্চার হতে শুরু করেছিল। ১৮৭০ ও ৮০ র দশকে পূর্ববঙ্গে চড়া মাত্রায় জমিদারী দাবির ফলে রায়তরা প্রতিবাদ করতে থাকে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া, রাজশাহীর মতো পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে এই ধরনের আন্দোলন হচ্ছিল। সুতরাং আর্থিক ভাবে শোষনের এই ধারাবাহিকতা বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের অসন্তোষের কারন হয়ে উঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ইতিহাসের মোড় বদলাতে শুরু করেছিল।

বলা বাহুল্য ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে উপনিবেশিক সরকার কিছু সাংবিধানিক সংস্কার চালু করেছিলেন। যেমন ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশন, ১৯৪৫ সালের ওয়াভেল পরিকল্পনা, ১৯৪৬ সালের সংবিধান সভা এবং পরিশেষে ১৯৪৭ সালের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা। এইসব সাংবিধানিক পরিকল্পনা গুলির অন্তিম পরিনতি হল দেশভাগ ও স্বাধীনতা। তবে ভারত বিভাজন এই প্রথমবার পরিকল্পনা হয়েছিল, তা নয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমেই প্রথম বিভাজন নীতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই বঙ্গ বিভাজন ১৯১১তে রদ করা গেলেও ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজন রদ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের গর্ভনর জেনারেল ও ভাইসরয় হিসাবে আসেন লর্ড কার্জন। তিনি কনজারভেটিভ পার্টির রাজনীতিবিদ। ভারতে এসে প্রশাসনিক সুখ্যাতির সাথে সাথে অনেক কুখ্যাতিও পেয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন প্রশাসনের দক্ষতা ও শাসিতের সন্তোষ দুটিই তাঁর চোখে সমান[৫]। বঙ্গভঙ্গের সাথে সাথেই ভারতে জাতীয়তাবাদের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল।

ভারত স্বাধীন হয়েছিল দীর্ঘ প্রায় দুঁশ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। বহু রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরে দেশ স্বাধীন হল বটে, কিন্তু টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিল ভারত উপমহাদেশকে। সাতচল্লিশে ভারত বিভাজন হয়ে পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হল। আবার এই পুর্ব পাকিস্তান পরিবর্তিত হল মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা বাংলাদেশ নামে গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ হিসাবে। সুতরাং এই ভাঙ্গা গড়ার খেলার মাঝে সাহিত্যিকদের মনজগৎ হয়েছিল আঘাত প্রাপ্ত। সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা মানুষকে শান্তি দিলেও রাতারাতি বাস্তুচ্যুত হলে দেশত্যাগী জীবনের যুদ্ধ সাহিত্যিকদেরও ভাবতে বাধ্য করেছিল। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দপর্ন স্বরূপ, তাই দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, বেকারত্ব, আর্থিক সংকট প্রভৃতি বিষয়গুলি সাহিত্যেও তার স্থান করে নিয়েছিল। সাহিত্যিকরা এইসব অনাচার অব্যবস্থাগুলি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একদিকে যেমন তাঁদের সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন, তেমনি অপর দিকে এটাও বলা যেতে পারে সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ স্বরূপ সমসাময়িক ঘটনাবলী তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন। ভারতের দুই প্রান্ত দেশভাগ জনিত কারনে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব প্রান্ত তথা বাংলায় সেই আঘাতের ক্ষত সর্বাপেক্ষা বেশী। ভারত ভাগ হওয়ার পর বাংলার যে বিভাজন তা ইতিহাসের দৃষ্টান্তমূলক একটি বিষয়। বাংলাকে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষা, জীবিকা, জনজাতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রবল ধাক্কা বলা চলে এই বিভাজনকে। তার পরে পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির সময়েও মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই যে পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরী হয়েছিল, এর অভিঘাত পরিবর্তিত হয়ে তৎকালীন ভারতের অন্তর্গত বাংলা বা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে স্পর্শ করেছিল। কারন সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে একাত্তরের সময়সীমার মধ্যে বহু মানুষ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতের অন্তর্গত বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। ভারতভুক্ত বাংলা থেকে যত না মানুষ তখন পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশী পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ ভারতভুক্ত বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এইসব বাস্তুহারা দেশত্যাগী মানুষরা উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রনা ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা চোখের সামনে দেশকে ভিনদেশে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। সেইসব মানুষদের মধ্যে বহু বিদগ্ধ সাহিত্যিকরাও ছিলেন। তাই তাঁদের রচনার মধ্যে ভিটে মাটি হারা দুঃখ কষ্ঠের বিষয়টি উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ভারত অন্তর্গত বাংলা অর্থাৎ অধুনা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা সেইসব সাহিত্যিকদের বিশেষ করে কথাসাহিত্যের রচনাগুলি দেশভাগ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হল এই সাহিত্য। কথাসাহিত্যের মধ্যে উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ অর্ন্তভুক্ত। তাই এপার বাংলার কথাসাহিত্যিকদের নিয়েই আলোচ্য বিষয় আবর্তিত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল ভারতের ইতিহাসে পটপরিবর্তনের সময়। তাই বাংলা কথা সাহিত্যের মধ্যেও এই সময়ের বিভিন্ন দিকগুলি উঠে এসেছে। এপার বাংলার কথাসাহিত্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল- জীবনানন্দ দাসের জলপাইহাটি (১৯৪৮), বাসমতীর উপাখ্যান (১৯৪৮), অমরেন্দ্র ঘোষের ভাঙছে শুধূ ভাঙছে (১৯৫০), মন্থন (১৯৫৪), ঠিকানা বদল (১৯৫৭), বনফুলের পঞ্চপর্ব (১৯৫৪), ত্রিবর্ন (১৯৬৩), অমিয়ভূষন মজুমদারের গড় শ্রীখন্ড (১৯৫৭), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দূরভাষিনী (১৯৫২), উপনগর (১৯৬৩), মহানগর (১৯৫৩), প্রবোধকুমার সান্যালের হাসুবানু (১৯৫২), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্বজনীন (১৯৫২), অমিয়ভূষন মজুমদারের নির্বাস (১৯৫৯), প্রতিভা বসুর সমুদ্র হৃদয় (১৯৫৯), রমেশচন্দ্র সেনের পূর্ব থেকে পশ্চিমে (১৯৫৬), নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাল্মীকি (১৯৫৮), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাশ্বেতা (১৯৬০), যোগভ্রষ্ট (১৯৬০), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), সমরেশ বসুর সুচাঁদের স্বদের যাত্রা (১৯৬৯), সওদাগর (১৯৭১), খন্ডিতা (১৯৮৭), সুনীল গঙ্গোঁপাধ্যায়ের, অর্জুন (১৯৭১), পূর্ব পশ্চিম (১৯৮৯), প্রফুল্ল রায়ের কেয়াপাতার নৌকা (১৯৭০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠপাখির খোঁজে (১৯৭১), গৌরকিশোর ঘোষের জলপড়ে পাতা নড়ে (১৯৭৮), প্রেম নেই (১৯৮১), জ্যোর্তিময়ী দেবীর এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা (১৯৬৭), হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখি (২০০৬), আখতার জামান হুলিয়ায়ের খোয়ানামা (১৯৯৬) সহ অসংখ্য উপন্যাস বিদ্যমান। ছোটগল্পও নেহাত কম নেই। দেশভাগ কেন্দ্রিক ছোট গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নবেন্দু ঘোষের উলুখড়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খতিয়ান, রমেশচন্দ্র সেনের পথের কাঁটা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভারতবর্ষ, দেবেশ রায়ের উদ্বাস্তু, জ্যোর্তিময়ী দেবীর সেই ছেলেটা, নরেন্দ্র নাথ মিত্রের জৈব সহ আরো ছোটগল্প বাংলা দেশভাগ কথাসাহিত্যে তাদের ছাপ ফেলে গেছে।

চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত শুধুমাত্র দেশভাগই হয়নি, দেশভাগের সাথে অসংখ্য সমস্যাগুলিও তখন সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা, পুর্নবাসন, খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম আন্দোলন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি উক্ত দশকগুলিতে ঘটনা বহুল হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা সর্বাপেক্ষা জটিল। চল্লিশের দশকের মধ্যকালীন সময়ে ধর্মীয় অসন্তোষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা দেশত্যাগী হতে শুরু করেছিল। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীর দাঙ্গার পর থেকেই মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা কলকাতা তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে চলে আসতে থাকে। মূলত এই পর্যায়টি ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ঐ সময় উদ্বাস্তু আগমন অনেকটাই ক্ষীন হয়ে এসেছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চে প্রায় ১০ লক্ষ উদ্বাস্তু চলে এসেছিল এবং জুন মানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১১ লক্ষ। এদের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ ছিল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বাকী সাড়ে পাঁচলক্ষ ছিল গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৫০ সালে হিন্দু সংখ্যালঘুদের আগমন বাড়তে থাকে। বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা হিন্দুদের উপরে অত্যাচার ও নিপীড়ন বাড়াতে থাকে। তখন প্রায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে নিরুপায় মানুষরা ভারতে চলে আসে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। ১৯৬০-৬১ সালে উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। পাবনা (১৯৬২) ও রাজশাহি (১৯৬৪) ও ঢাকা (১৯৬৫) তে ব্যাপকভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়। যার ফলে ভয়ে প্রান ও ধর্ম রক্ষা করতে প্রচুর হিন্দু পূর্ববঙ্গীয়রা বাঁচার তাগিদে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছিল[৬]। হিন্দুদের ঘর পুড়িয়ে ফেলা হোত, ফলে তারা গৃহহীন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছিল।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশক ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সাক্ষী বলা যেতে পারে। ভারত ভাগকে কেন্দ্র করে চারপাশে তখন বিহ্বল অবস্থা। নোয়াখালী ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষকে ভয়ভীত করে তুলেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ায় একদিকে যেমন আনন্দ ও উচ্ছাস প্রকাশ পাচ্ছিল, তেমনি অপরদিকে দেশত্যাগী বাস্তুহারা, স্বজন ছাড়ার যন্ত্রনাও ফুটে উঠছিল। এই বাস্তবতা কথাসাহিত্যিকদের লেখনীর মধ্যেও স্থান পেয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে উপন্যাস দুটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল জীবনানন্দ দাশের জলপাইহাটি ও বাসমতীর উপাখ্যান। উপন্যাস দুটির রচনাকাল ১৯৪৮ সাল। দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা উক্ত উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। বিভাজনের পরে পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের প্রতিছবি তাতে ফুটে উঠেছে। দুটি উপন্যাসে যেমন দেখা গেছে তেমনি দেশবিভাজনের ফলে যে অনাগত স্থিতিহীন জীবনের ভাঙন এসেছিল তার বিবরন পাওয়া যায়।

জীবনানন্দের লেখা উপন্যাসগুলি তাঁর বেঁচে থাকাকালীন প্রকাশিত হয়নি। তদুপরি তাঁর বেশীরভাগ উপন্যাসই অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। তবে 'জলপাইহাটি' ও 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাস দুটি সম্পূর্ণ লেখা। ১৯৪৮ সালে লেখা তাঁর জলপাইহাটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশীথ সেন। পেশায় একজন অধ্যাপক। পূর্ববাংলার জলপাইহাটিতে বেসরকারি কলেজের ইংরেজী পড়াতেন। কিন্তু আর্থিকভাবে পরিস্থিতির তাড়নায় তিনি অসুস্থ স্ত্রীকে প্রতিবেশীদের দায়িত্বে রেখে কলকাতায় চলে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় সম্মানজনক একটি জীবিকা পাওয়া। নিশীথের স্ত্রী সুমনা রক্তাল্পতায় ভুগছিল। কলকাতায় তিনি তাঁর বন্ধু জিতেন দাশগুপ্তের গৃহে ওঠেন। তিনি ভেবেছিলেন কলকাতা শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কারনে এখানে হয়ত কোন কলেজ ইউনির্ভাসিটির ব্যক্তিদের সাহায্যে কলকাতার কোন উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরী পাবেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তাকে প্রতি পদে লড়াই করতে হয়। অন্যদিকে তার একটি কন্যার খোঁজ নেই। হারিয়ে গেছে না পালিয়ে গেছে সেই খার নেই। আর এক কন্যা যক্ষা রোগে আক্রান্ত। কাঁচড়াপাড়া টি.বি হসপিটালে ভর্তি। নিশীথের বাইস বছর বয়সী ছেলে বি.এ পাশ করে সঙ্গ দোষে জীবন সম্পর্কে দিকভ্রষ্ট। নিশীথের স্ত্রীয়ের রক্তাল্পতায় প্রতিবেশী নরেন মিত্তির রক্ত দিচ্ছে। ছেলে হারীত জলপাইহাটিতে রাজনীতি করে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে হারীত কংগ্রেস ছেড়ে সোশ্যালিষ্ট পাটিতেও যোগ দেয়। ওদিকে নিশীথ কলকাতায় এসে চাকরীর সুরাহা না পেয়ে পুনরায় জলপাইহাটিতে ফিরে যায়। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু মোটামুটি এটাই। কিন্তু এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে দেশভাগজনিত বিভিন্ন বিষয়ের শাখা প্রশাখা বিন্যস্ত হয়েছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশীথের মতোই উপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ নিজের অঞ্চল বরিশাল ত্যাগ করে কলকাতার ভাড়া বাড়িতে চলে এসেছিলেন। তিনিও কলকাতায় এসে অর্থের অভাব, বেকারত্ব, স্থানসংকুলানে জর্জরিত ছিলেন। ১৯৪৬ – এ জীবনানন্দ বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জীবনানন্দের মতো আরো অনেক অধ্যাপক দেশ ত্যাগ করেছিলেন। বলাবাহুল্য এঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু। জীবনানন্দও কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায় এবং বেকারত্বের জীবনে পর্দাপন করেছিলেন[৭]। আলোচ্য উপন্যাসটি তাই জীবনানন্দের সেই কঠোর দিনগুলিতে লেখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সমগ্র বিশ্ব দেখেছিল। সেই বিভীষিকা কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সারাবিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলিও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। পারমানবিক শক্তি প্রয়োগের খেলা শুরু হয়েছিল। ভয়ংকর হত্যালীলার সেই আঁচ থেকে রক্ষা পায়নি উপমহাদেশও। বলাবাহুল্য এই যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তাঁর উপন্যাসে প্রভাব ফেলেছিল। যে সময় এই উপন্যাসটি রচিত সেই সময়ে যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ বিভাজন, উদ্বাস্তু সমস্যার দশক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় পর্বের অধিকাংশ উপন্যাসেই সেই অভিঘাতের চিহ্ন দেখা যায়[৮]। কলকাতাতে এসেও যে অধ্যাপনার চাকরীতে বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি সেটাও উপন্যাসে তিনি ব্যক্ত করেছেন –

> "আজকাল পাকিস্তানের হিন্দু ছেলেরা দল বেঁধে কলকাতায় পালিয়ে এসে জয়নাথের বড় সুবিধে করে দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অধ্যাপকদের নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব ইচ্ছে জয়নাথের, কিন্তু পথ পাচ্ছেনা এবং হাজার হাজার ছেলে বাড়ছে, পুরোন কলেজ বাড়িতে আঁটছে না কোথাও আর...।"[৯]

আবার উপন্যাসের এটাও বলা হয়ে কিভাবে পূর্ব বাংলা থেকে মানুষ এসে কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়।

> "পূর্ব বাংলার কলেজগুলো ফতুর হয়ে পশ্চিমবাংলার কলেজগুলোকে ছেলেতে ছেলেতে ফাঁপিয়ে তুলল...।"[১০]

উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র কুলদা প্রসাদের বাড়ী ভাড়া নিয়েও উপন্যাসিক বাংলা ভাগের প্রসঙ্গ এনেছেন। আসলে ভারত ও পাকিস্থান দুটি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু অখন্ড বাংলা ভাগ মেনে নেওয়া কষ্ট কর ছিল। দেশভাগ না হলে কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু জনগনের ভিড় হতোনা এই দেশে। বাড়ী ভাড়া প্রসঙ্গে কুলদা জানায় –

> "চারশো, সাড়ে চারশো, পেতে পারতুম, কুমড়ো কেটে দুফালি হবার মুখে তোবা তোবা করে তুলে দিলে–" নিশীথ জিজ্ঞাসা করে "কুমড়ো কেটে দুফালি হওয়া কাকে বলে কুলদা?"

ললিতা ঘরের ভেতর থেকেই বলে ওঠে - "এক ফালি হল পশ্চিমবাংলা, আর এক ফালি পাকিস্তান ...।"[১১]

দেশভাগের সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্পর্ক বিশেষভাবে যুক্ত। রাতারাতি বিভাজনের ফলে হিন্দু ও মুসলিমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু ধর্মীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। জলপাইহাটি উপন্যাসে এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ভীষন ভাবেই সুস্পষ্ট। যেমন নিশীথের বন্ধু রবিশঙ্কর মুসলিমদের –

> "...মুশকিলে পড়েছিলুম ওয়েষ্ট পাঞ্জাবে। তখনো দাঙ্গা চলছে সেখানে। ...দু'জন মুসলমান এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে – আমি যতই বলি যে আমি বাঙালি মুসলমান, আমার নাম লালন ফকির, কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, তখন একটি কথা মনে পড়ে গেল – একসাথে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসি পেল। বললুম আমি সারকামসিশন মানে সুন্নৎ করেছি, সেটা দেখালে বিশ্বাস হবে তো? কিছুটা নরম হল বটে কিন্তু তবুও দেখতে চাইল ...যদি অগ্রভাগ কাটা না থাকে আমার মাথা কাটবে।"[১২]

পরবর্তীকালে উপন্যাসে জানা গেল মাদ্রাজে দশ বছর আগে অবিনাশ লিঙ্গ তাকে ফাইমসিস অপারেশন করেছিল যে কারনে পাঞ্জাবে সে রক্ষা পেয়েছিল মৃত্যুর হাত থেকে, কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ নয়। রামশঙ্কর দিল্লীতে গিয়ে হিন্দুদের রোষানলে পড়েছিল। যে নিশীথকে বলে – ''ট্রেনে দিল্লীতে অবিশ্রাম হিন্দুদের মধ্যেই চলতে ফিরতে হত আমার, কিন্তু নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে করতে পারতুম না, অবিনাশলিঙ্গের মুন্ডপাত করতে করতে দূর্গা বলে ঝুলে পড়তুম রোজ'।

> - কেন? হিন্দুদের ভিতর ঘুরে ফিরে কী ভয়?'
> - দুটো মাস আমার জান খেয়ে নিয়েছে হিন্দুরা।
> - 'হিন্দুরা? হিন্দুর বাচ্ছাকে?
> - কিন্তু অবিনাশলিঙ্গের কারসাজির ফলে আমার হিন্দু অভিজ্ঞান তো পাচার হয়ে গেছে"[১৩]।

হিন্দু মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মানদন্ড হয়ে উঠেছিল একজন ব্যক্তির অসুস্থতার শল্য চিকিৎসার ওপরে। শারীরিকভাবে যদি ধর্মীয় চিহ্ন না থাকে তবে বিপরীত পক্ষের মানুষটি হয়ে উঠত অযাচিত ভাবে শত্রু। শেষে দিল্লীতে মাদ্রাজী পাগড়ী পড়ে, কপালে ত্রিশূল কেটে তার হিন্দুত্বের পরিচয় বহন করত।[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 310 - 315
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনানন্দের সাহিত্যে প্রকৃতি, একাকিত্ব, সময়, জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে যেমন আলোচনা হতে দেখা গেছে তেমনি দেশভাগজনিত দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। অস্তিত্বের সংকটই যেনো বার বার উন্মোচন হয়েছে তাঁর লেখায়। জীবনের সেই যন্ত্রনার স্তরগুলির বিন্যাস ঘটেছে সাহিত্যের মধ্যে। জলপাইহাটি উপন্যাসেও সেই স্তরটির প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। সামাজিক অবক্ষয় আর্থিক অনটনে ক্লান্ত মানুষ, শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্খী মানুষের যন্ত্রনা, দাঙ্গা ক্লিষ্ট বৈরীতা প্রভৃতি আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া থেকে সবেমাত্র তখন বিশ্ব রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছিল সুদূর প্রসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করেছিল। সেই বিপর্যয়জনক অবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ সাধারন মানুষের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জীবনানন্দের উপন্যাসে সেই আখ্যান ব্যক্ত হয়েছিল। মানবজীবনের চরম হতাশা ও বিপর্যয়ের মর্মভেদী বিবরণ রচনার দিক থেকে তিনি একজন স্বার্থক ঔপন্যাসিক বলা অত্যুক্তি হবেনা। দেশভাগ সাহিত্যে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের ভূমিকা তাই অপরিসীম।

Reference:

১. মজুমদার, শ্রী রমেশচন্দ্র, ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’, প্রথমখন্ড, দিব্যপ্রকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১ পৃ. ২৪
২. ত্বদেব, পৃ. ২২
৩. রায়, নীহাররঞ্জন, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ১২৪
৪. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’, দ্বিতীয় খন্ড, দিব্য প্রকাশক, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬০
৫. সরকার, সুমিত, ‘আধুনিক ভারত’, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৫
৬. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, ‘প্রান্তিকমানব’, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৮-১৯
৭. সেন, অরুন, জীবনানন্দ দাশ জীবনী, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ১৯৯৪ খ্রিঃ, জীবনানন্দ সংখ্যা, পৃ. ৪০৬, সিনহা, হেনা, ‘বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ : ভগ্ননীড়ের বেদনা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৯
৮. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ও অর্ন্তবাস্তবতা : জীবনানন্দের উপন্যাস, জীবনানন্দ, গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, ‘সাহিত্যলোক’, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৯৮, সিনহা, হেনা, ‘বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ’ ভগ্ননীড়ের বেদনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০
৯. দাশ, জীবনানন্দ, ‘জলপাইহাটি’, www.amarboi.com, পৃ. ৪৬২
১০. ত্বদেব, পৃ. ৪৬৬
১১. ত্বদেব, পৃ. ৪৫৮
১২. ত্বদেব, পৃ. ৪৩৭, ৪৩৮
১৩. ত্বদেব, পৃ. ৪৩৮
১৪. ত্বদেব, পৃ. ৪৩৯